৭২

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...1.2 SEP.. ১৯৯৮ ... ..
পৃঃ ৫ কলাম ৭ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে দানবের দাপাদাপি

কে. এম. সোবহান

অগোছালো কোন শিল্পীর আঁকা ছবির মত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকলে সবুজ ঘেরা ঐ এলাকায় গেলে মনেই হয় না কোন ব্যস্ততা কোথাও আছে। সবুজ গাছের পাতার ফাঁকে পাখির ডাক। জলাশয়গুলোতে টলমল করছে পানি। এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যেও দানবের পদচারণা চঞ্চল করেছে, আতংকিত করেছে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের। হঠাৎ করে বললেও বোধহয় ঠিক বলা হয় না, এখানে রটে গেল তিনটি ছাত্রী ধর্ষিত হয়েছে তাদেরই সতীর্থদের দ্বারা। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও অচিরেই সঠিকভাবেই প্রচারিত হলো যে ঘটনা সত্য, নির্মমভাবে সত্য। এই ধরনের ঘটনা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কানাঘুষা চলছিল। আতংকিত ছাত্রীরা সাহস করে এগিয়ে আসেনি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। তারপর যে আবরণ সামাজিকতার আবরণ তাদের আচ্ছাদিত করে রেখেছিল তা ছুঁড়ে ফেলে ছাত্র-ছাত্রীরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবি করল বিচার করতে হবে। কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাল অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। দোষীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক- সময় এক কাজের মেয়ে ধর্ষিত হয় ছাত্রদ্বারা তার বিচারও হয়নি। দৈনিক 'মানবজমিনে' কয়েকমাস আগে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল ছাত্রী-শিক্ষকের মধ্যে এক নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা। তার কোন প্রতিবাদ হয়েছিল কিনা জানা নেই। সম্ভবত কোন প্রতিবাদ হয়নি যদিও শিক্ষক এবং ছাত্রী পরিচয় অতি পরিষ্কারভাবে ঐ কাগজে ছাপা হয়েছিল। মানবজমিনের ঐ প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য ছিল।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইদানীং যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে তা নিয়ে কেন একটি আন্দোলন দানা বেঁধেছে। আন্দোলন দানা বেঁধেছে তার কারণ বিষয়টি রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে এবং একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের নেতারা এর সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেছে ছেলে-মেয়েরা। ঐ সংগঠনের ছাত্র সদস্যরাও দাবি জানাল দোষীদের শাস্তি। ঐ সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন একটি সভা করছিল তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মহিলা শিক্ষক রেহনুমা আহমদ যিনি নিজেকে সৌখিন ফটোগ্রাফার বলে দাবি করেন সভার ছবি তুলছিলেন। এতে পরে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ঐ সংগঠনের পক্ষে ছাত্রলীগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা শিক্ষকের ক্যামেরা কেড়ে নেয় এবং তা ভেঙ্গে ফেলে এবং তাঁকেও অপমান করে। যে ঘটনা নিয়ে ছাত্রলীগ বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদমুখর ছিল সেই ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ যুক্ত হলো। ছাত্র-ছাত্রীরা আরও কর্মসূচী দিল। এক পর্যায়ে ঢাকা থেকে বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ, এনজিও নেতৃবৃন্দ এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব একটি পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশে যোগ দেন এবং চলমান আন্দোলনের প্রতি তাঁরা সংহতি প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে ঘটনাগুলোর তদন্তের দাবি এবং দোষীদের আইনানুগ শাস্তি দাবি করেন।

> *ঘটনা বেশ কিছুদিন আগেকার। প্রকাশ্য দিবালোকে অপহৃত হলো একজন ছাত্রী। অপহরণের খলনায়ক একজন মাস্তান। জানাজানি হলো, তদন্ত কমিটি হলো। কিন্তু ফল শূন্য, কর্তৃপক্ষ বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। কি আর হবে ঐ ঘটনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে! বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে ক্ষমাশীল হয়ে পড়েন কর্তাব্যক্তিরা অপরাধীদের বিরুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের গণহত্যাকারী, ধর্ষণকারীদের বিচারের প্রশ্ন তুললেই অনেকেই ঐ একই কথা বলে 'যা হবার হয়ে গেছে কি আর হবে সেই বিশ-পঁচিশ বছরের ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।"*

ঘটনাগুলো পৃথক। প্রথম ও প্রধান ঘটনাগুলো হচ্ছে ছাত্রীদের নির্যাতন এবং অপরাধ একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ-শিক্ষকের অবমাননা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি মেনে নিয়ে নির্যাতনের ঘটনাগুলোর জন্য সত্যতা যাচাই কমিটি গঠন করেন এবং শিক্ষক অবমাননার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। শিক্ষক অবমাননার ঘটনার পর যে তদন্ত কমিটি গঠিত হলো তা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কমিটির সদস্য ছিলেন প্রক্টর। ছাত্ররা প্রক্টরের কমিটির সদস্য করাতে আপত্তি জানাল। কারণ প্রক্টর প্রধান অভিযুক্ত ছাত্রের নিকটাত্মীয়। ছাত্রদের চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর পদত্যাগ গ্রহণে কিছুটা শৈথিল্য প্রকাশিত হয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। পরে তিনি বাদ পড়েন। যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই ওঠে তা হচ্ছে প্রক্টরের বিচার-বিবেচনার। তিনি জানতেন তাঁর আত্মীয়তা প্রধান অভিযুক্তের সঙ্গে। তাহলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেন কমিটি থেকে নিজেকে দূরে রাখেননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, কাজেই তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না যে তিনি সঠিক বিচার করতে পারবেন না অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কারণে। তিনি কি নিজেকে রাজা সলোমন মনে করেছিলেন। তিনি রাজা সলোমন হলেও তাঁর বিচারের প্রতি বক্র দৃষ্টি জনসাধারণের থাকত। কাজেই তিনি নিজে থেকে সরে না গিয়ে তিনি নিজের প্রতি অবিচার করেছেন এবং তাঁর পেশা-ভাবমূর্তিকে তিনি উজ্জ্বল করেননি সাধারণের কাছে।

নির্যাতনের ঘটনাগুলো সত্যতা যাচাই কমিটির তদন্তাধীন। এ কমিটির কাজ সহজ নয়। কোন নির্যাতিত ছাত্রী এককভাবে অভিযোগ করেনি তার দুর্ভোগের। জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আট শো ছাত্রী একস্বরে বলল, সে ধর্ষিতা। অর্থাৎ অভিযুক্ত কয়েকজন এবং অভিযোগকারী আটশো ছাত্রী। বিষয়টি তদন্তাধীন-কাজেই কোন মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। ছাত্রীরা জানাল, তারা আতংকিত এবং নিরাপত্তাহীনতার শিকার। যারা নির্যাতিতা তারা সরাসরি এগিয়ে এসে বলতে পারে না কে বা কারা তার নির্যাতনকারী। যদি বলে তাহলে সামাজিক সম্ভ্রমহানি ছাড়াও তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তার পরিবারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। বিচারে যাই হোক সংশ্লিষ্ট ছাত্রীটিকে হয়ত লেখাপড়ার পাট গুটিয়ে ত্যাগ করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। যার ফলে সামগ্রিকভাবে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিকতা মনোবৃত্তি একটি ধর্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করতে সায় দেবে না। ঐ ধর্ষিতার যদি বোন থাকে তাহলে তারও বিয়ে দেয়া কঠিন হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীহীন একটি ধর্ষিতা মেয়ের এই রক্ষণশীল সমাজে কি অবস্থান তা অনুমান করা মোটেও কষ্টকর নয়। এইসব কারণে ঐ আটশো মেয়েই সমস্বরে বলছে সে ধর্ষিতা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরও একটি ঘটনা বেশ কিছুদিন আগেকার। প্রকাশ্য দিবালোকে অপহৃত হলো একজন ছাত্রী। অপহরণের খলনায়ক একজন মাস্তান। জানাজানি হলো, তদন্ত কমিটি হলো। কিন্তু ফল শূন্য, কর্তৃপক্ষ বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। কি আর হবে ঐ ঘটনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে! বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে ক্ষমাশীল হয়ে পড়েন কর্তাব্যক্তিরা অপরাধীদের বিরুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের গণহত্যাকারী, ধর্ষণকারীদের বিচারের প্রশ্ন তুললেই অনেকেই ঐ একই কথা বলে 'যা হবার হয়ে গেছে কি আর হবে সেই বিশ-পঁচিশ বছরের ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করে!"

রেহনুমা আহমেদকে অপমান করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযুক্তসমেত আরও চারজনকে দল থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। তাকে দলভুক্ত করাটাই ভুল ছিল আওয়ামী লীগের জন্য। প্রধান অভিযুক্ত গত সরকারের আমলেও একজন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা ছিল। যখন সে ক্রমশঃই রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল বর্তমান সরকারের আমলে তখন সে মহাজনপন্থা অবলম্বন করে ডিগবাজি মেরে চলে এলো ছাত্রলীগে ক্ষমতার বলয়ে এবং তাকে দেয়াও হলো নেতৃত্ব। এ কেমন রাজনীতির নীতি! যে বিরোধীদলের মাস্তান ছিল সরকারী দলে এসেও সে মাস্তানি ফিরে পেল। তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে সে যে তার চারণভূমি এতো তাড়াতাড়ি এবং এত সহজে ছেড়ে যাবে না তার মাস্তানির নেতৃত্ব থেকে পদচ্যুত হবে তা মনে হয় না। তবে এটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। গত সোমবারের পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন আন্দোলন বন্ধ করে ক্লাস নেয়া আরম্ভ করেছেন। শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসুক এটা সকলেই চায়। অনেকে 'সত্যতা যাচাই কমিটি' নামটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বোধকরি ম্যান্ডেলার দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চেয়েছেন।

বর্তমানের ছাত্র-ছাত্রী আন্দোলনে প্রধানত দুটি গোষ্ঠী। একটি হচ্ছে অভিভাবক গোষ্ঠী। অপরটি নিজেদের 'সাধারণ ছাত্র ঐক্য' বলে পরিচয় দিয়েছে। দুই গোষ্ঠী দুটি লিফলেট ছেড়েছে। অভিভাবকবৃন্দের লিফলেটে বলা হয়েছে, 'অনেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনকে ছাত্রলীগ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দেখাতে চাইছেন। এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পাওয়া যায়। ছাত্রলীগ যদি ধর্ষণের মত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ছাত্রলীগ বিরোধী আন্দোলন বলে কোন দল মনে করবে না। আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান অনেকবার জোরেশোরে বলেছেন, সন্ত্রাসীর কোন দল নেই। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে এটা ছাত্রলীগ বিরোধী আন্দোলন, না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান সরকার বিরোধী যা পরিষ্কার হয়ে ওঠে 'সাধারণ ছাত্রঐক্য' লিফলেটটি পড়লেই। সেই লিফলেটে বলা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষণ ঘটনা সারাদেশে বিদ্যমান অসুস্থ অরাজক ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।' ধর্ষণ যেখানেই ঘটুক তার শিকার যেই হোক তা ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। কোন সুস্থ ব্যক্তি তাকে সমর্থন করতে পারে না, করছেও না। বর্তমান সরকার পুলিশের মধ্যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে যদিও তা যথেষ্ট নয়, তবুও এটুকুই ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। দেশে অসংখ্য খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি-ছিনতাই হচ্ছে, কিন্তু তবুও অরাজকতার রূপ নেয়নি-নিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা অন্য প্রশাসনের আমলের মত বলা হতো, কি আর হবে যা হবার তা হয়েই গেছে ইত্যাদি। নিরাপত্তাহীনতা কোন নতুন ঘটনা নয়। জাতির পিতাসহ তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং জেলে চার নেতার হত্যা নিরাপত্তাহীনতার চরম নিদর্শন। জেল সবচেয়ে নিরাপদ স্থান, কিন্তু সেখানে সন্ত্রাসী ঘাতকের শিকার হয়েছে চারজন জাতীয় নেতা। সেখানেই ঘটনা থেমে থাকেনি- আইন প্রণয়ন করা হলো যাতে বিচার না হয়। সাংবিধানিকরূপও দেয়া হলো ঐ বেআইনি ঘোষণাকে। ঘাতকদের পুরস্কৃত করা হলো। আইনের শাসনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। গণতন্ত্রের নামে নির্বাচিত সরকার স্বৈরাচারিতা করেছে।

অসুস্থ, অরাজক ও নিরাপত্তাহীন অবস্থার কথা ভিন্ন ভাষায় প্রায়ই শোনা যায় বিরোধী দলীয় নেত্রীর মুখে। সাধারণ ছাত্রঐক্য অত্যন্ত নিরীহভাবে যা বলার চেষ্টা করছে সেটা নির্দেশ দিচ্ছে একটি ইস্যুর যার সন্ধানে রয়েছেন বিরোধী দলীয় নেত্রী। সাধারণ ছাত্রদের ঐ একমত পোষণ না করাই স্বাভাবিক তবে তাদের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ। সাধারণ ছাত্রঐক্যের দাবির মধ্যে একটি হচ্ছে (৩নং) ধর্ষণসহ অন্য যে কোন ধরনের যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাৎক্ষণিক বিচার করার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এই দাবির মধ্যে সামরিক শাসনামলের মনোবৃত্তির প্রকাশ রয়েছে। তাৎক্ষণিক বিচার করার আগে দোষীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিতে হবে। এটা তার সাংবিধানিক অধিকার। ❑